তাঁর কাব্যে সুনির্বাচিত তৎসম শব্দ দেখা যায়, তার সাথে সংস্কৃতজাত শব্দ এবং দেশী অন্নদার মাধুর্য লক্ষ্যণীয় করেছেন —

অচল সর্ব্ব চল অর্ব্ব শুনিতে কান
অবাধ সর্ব্বত্র গতাগতি,

মহাদেবের দেবীর মধুসংবাদ শুনে মহাদেব যখন ক্রুদ্ধ হন এবং ওঠেন এবং দক্ষালয়ে যাত্রা করেন তখন তাণ্ডবের ভয়াবহ ধ্বংসের শব্দ কীভাবে ধরা দিয়েছেন, —

মহারুদ্র রাগে মহাদেব সাজে
দেদুম্ দেদুম্ শিঙ্গাঁ ঘোর বাজে
লটাপাশ এচীকুচ সংঘাড় সাঁহাঁ
দুলাদুল চলাচল কলঙ্কল তরঙ্গাঁ

এইসব শিবের তাণ্ডবলীলা আবার ধ্বংসের আভাসকে আলোড়ন — ধ্বনি সাথে এখানে ধ্বনিময় ও চিত্রময় হয়ে উঠেছে।

কাব্যের প্রস্তুতিপর্বে নগরী আগমনের কথা হয়ে বলেছেন তখন তার উপযোগী আবহ-সংগীত শব্দের ব্যবহার পাইয়েছেন তাই, যেমন —

নটরোনা, ঘোগাব ইত্যাদি, আবার লোকপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগও তিনি করেছেন, বিবাহের সময়ে কুল ললনারা যখন ক্রন্দন করছে তখন তাদের কোলাহলের সঙ্গে আহাঁ আহাঁ এবং জোয়ার ধ্বনিও অভিব্যক্তি লাভ করে ক্রমে ফুটে উঠেছে, শ্লেষাত্মক নামগুলির ব্যবহারও তার ব্যবহার করেছেন, যেমন — হরগৌরীর ছদ্মবেশের আলোচনা গৌরী বলেছেন —

পুরুষেরা দেখ যদি নারী মারি যায়
অন্যনারী ধরে আনে নাহি ঘুচে তায়

লৌকিক শব্দের প্রয়োগেও তাঁর অসামান্য নিপুণতা, অন্নদার ভবিষ্যৎ বরের বর্ণনায় তিনি বলেছেন —

যেহাঁর ঠিকুন নাহি ঘরে হীলাবালি
ছাই ভাই ভাঙ্গড়ের ভাঙ্গড়ের ভাঙ্গালি

বাংলা বাঙ্গালোচনার এক অধ্যায় দুরূহ ভারতচন্দ্র মানুষের ভারতচন্দ্র নিজের প্রতিভাবলে তা দেখিয়েছেন প্রকৃতপক্ষে ভারতচন্দ্রের শব্দচয়ন ক্ষমতাই প্রধান হয়েছিল তাঁর

"আই আই এ ছুড়া কি এই গৌরির বর লো,
বিয়ার বেলা এও'র মাথে হেল দীগম্বর লো।।"

মঙ্গলকাব্য ছন্দেরও উদাহরণ তাঁর কাব্যে মেলে। আবার দ্বিপদী-পয়ার ছন্দ অবলম্বনে তিনি লিখেছেন —

দ্বিপদী পয়ারে কার ভারতী দে —
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে।।

আবার দ্বিনক ছন্দেও প্রয়োগ করেছেন যতনি —

মিল দয় হিত সয় বিজয়নাদ ছাড়িছে,
ভারতের দুনচে দুন্দুভি বাড়িছে।।

যখন সারা লাচাড়ীর বাঁধা ধরা প্রয়োগে বাঙলাকাব্যের গতিরীতি শিথিল হয়ে পড়েছিল তখন ভারতচন্দ্রের অলংকারনিষ্ঠ বাক্যবিন্যাসে আবার তা অপূর্ব বলিষ্ঠতায় দৃঢ়, ঝঙ্কারময় হয়ে উঠেছে। বস্তুত ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যের মধ্যে এই সমস্ত অনন্য দক্ষতা যেমন প্রকটিত করে তুলেছেন, তেমনি প্রবাদ প্রবচন প্রয়োগে এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবতায় কাব্যটিকে অনন্য সাধারণ করে তুলেছেন। আগেই দেখেছি রাজসভার মনরঞ্জনের জন্য তিনি কলম ধরেছিলেন, অতএব কাব্যটিকে মনুষ্যলোক আশ্রিত এবং জীবনের সাধারণোক্তি করে তুলেছিলেন তাই তাঁর কাব্যটি গ্রামীণ জীবন সম্পৃক্ত গোষ্ঠীর সৃষ্টি রূপে দেখা দেয়নি। কাব্যের মধ্যে সম্পৃক্ত রচনায় হীরের দ্যুতির মত ঝলমল করে উঠেছে।

অলংকার নিপুণতার ছবি

সমস্ত অলংকারকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা যায়, — শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার। শব্দালঙ্কার অনেক রকমের, তাঁর মধ্যে ভারতচন্দ্র নিজের কাব্যে যে শব্দালঙ্কার ব্যবহার করেছিলেন সেগুলি হল যমক, শ্লেষ, অনুপ্রাস প্রভৃতি। আর অর্থালঙ্কারের মধ্যে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, বিরোধাভাস, অর্থান্তরন্যাস এবং ব্যাজস্তুতি প্রভৃতি। এছাড়া কাব্যের দুর্লভ প্রসাদ, দৃষ্টান্ত এবং ভৌতিক প্রভৃতি দুর্লভ তিনি ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচনায় অন্ত্যযমকের চমক এই রকমের — "ভারত ভাবত ভ্যাত আপনার গুনে"। মধ্য যমকের প্রয়োগ এইরকম — "পাখীরা চরন করি-করি ডেকে আসা"। ধ্বনিপুঞ্জ ঝিল্লীর মতো বিদ্যাত্মক শব্দগুলি এমনভাবে প্রয়োগ করেছেন যাতে তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। — "লটপট জটা লপটে পায়"

ঝর ঝর ঝর জাহ্নবী তায়
ঘর ঘর ঘর ঘরেছে গান
দপ দপ দপ দীপয়েমান"

এসব ক্ষেত্রে বিদ্যাত্মক শব্দের বহুল ব্যবহার শিবের ধ্যানের ধ্বনির আলঙ্কারে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। অনুপ্রাসে ভারতচন্দ্রের দক্ষতা অনুপম, এমনকি অন্ত্যানুপ্রাসে তিনি অনবদ্য নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, অর্থালঙ্কারের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতার একটি উদাহরণ এইরকম —

"কে বলে শারদ শশি সে মুখের তুলা
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা"

বিশেষোক্তি অলঙ্কার প্রয়োগেও তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন, বিরোধাভাসের প্রয়োগ সুন্দর হয়ে উঠেছে, যেমন —

"অচেত সর্বচেতন অচল স্থানিতে পান
অবাদ সর্বত্র যাতায়াত।

ভারতচন্দ্র ছিলেন রাজ সভার কবি স্বভাবতই রাজসভার সদস্যদের মনরঞ্জনের জন্যে তাঁকে শিল্পী চাতুর্য অবলম্বন করতে হয়েছে, এবং তারই ফলে মঙ্গলকাব্যের কাব্য কাঠামোর অবলম্বন করে তিনি এক বিচিত্র মর্মর মন্দির রচনা করে ছিলেন। মঙ্গলকাব্য এখানেই সমাপ্ত, সেই সমাপ্তির দেখরাখলার উপর ভারতচন্দ্রের কবিকীর্তি যেন সমাধিজ্ঞানে ধ্যানমগ্ন মর্মর প্রাসাদ। সেই প্রাসাদে কারুকার্যের সীমা পারসীমা নেই। এই কারনেই ভারতচন্দ্রের রচনাটি হয়ে উঠেছে রাজকণ্ঠের মনিমালার মত। কবি নিজস্ব শিল্পচেতনায় লোকের বীমালী ছন্দকে তিনি অনন্য ভাবে প্রয়োগ করেছেন যাতে তাঁর প্রাণশক্তির খেলা ছড়িয়ে পড়েছে। তাতেই সুদীর্ঘ আঠারোটি অক্ষরাঘাত প্রবীন ছন্দের রূপ বিকশিত —

"রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল যেন রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, কেবল তাহার উজ্জ্বলতা নেই তাহার কারুকার্য" — আলোচনা কর।

ভারতচন্দ্র রায় কবিগুরুর আক্ষেপোক্তি তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেছেন, তিনি মঙ্গলকাব্য পরম্পরাতেই বিশ্বাসী; দেবী-প্রাধান্য উপেক্ষণীয়, কিন্তু মঙ্গল কাব্যের এই শ্মশান ছবির বুকেই ভারতচন্দ্র এমন মণিহার তুলে ধরলেন যা সৃষ্টির ঐশ্বর্যে রাজপ্রাসাদের মত, তেমন শ্মশানের বুকে প্রকাশিত প্রজাই অসাধারণ রাজপ্রাসাদ। রবীন্দ্রনাথ এদিকেলেখেই 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যকে রাজকণ্ঠের মণিমালা বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি বিশেষ ছন্দে রচিত তবুও প্রথম ছন্দেই 'রাজকণ্ঠের মণিমালা' আভাসের তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। যে শব্দ বিন্যাস, ছন্দের বৈচিত্র আর ভাষাশিল্পের সৌকর্য মিলে ভারতচন্দ্রের কাব্যজগতে অবাধ্য শিল্পকলা মাধুর্যের উন্মেষ ঘটে তার সব গুণ বৈশিষ্ট্যই এই প্রথম ছন্দে বিদ্যমান। প্রারম্ভিক বিষয়গুলি তুলে ধরলেই আমরা এই উপমার তাৎপর্য বুঝতে পারব।

সাধারণভাবে মঙ্গলকাব্য এক গোষ্ঠীর সৃষ্টি, কিন্তু অমলশীল ও বাক্‌বৈদগ্ধ্য পূর্ণ রাজসভার কবি ভারতচন্দ্র তাকে ব্যক্তিগত সৃষ্টির মাধ্যমে মণ্ডিত করে তুলেছেন। দেবীমায়া কাব্যরস সঞ্চারে কবির একান্ত সুদৃঢ় প্রত্যয় ছিল, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, "যে গীত শ্রোতার কাব্যরসলোভে কবি এমনতে যে সেইমতো পাঠ করেছেন সেইমত লিখলেই চলেনা, তাতে কাব্য প্রসাদগুণ সমন্বিত এবং রসাল হতে পারেনা, শ্রোতার — "অরুচকহি লাগে যাবনি মিশাল"।

অনেক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর মতামত প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে বিষয়কে একান্তভাবে তোলার জন্যে শ্রোতাদের শব্দ প্রয়োগ, অনেক ক্ষেত্রে অন্যের কাছে গ্রহণীয় করে তোলার জন্যই এই পদ অবলম্বন করা দরকার। কবিগুরুর আক্ষেপোক্তির ভারতচন্দ্রের ছিল এই বিষয়ের সচেতনতা, তাই কাব্যরসের উপযোগী কাব্য নির্মাণ করতে ভারতচন্দ্র উপযুক্ত শব্দ সন্নিবেশিত করেছেন, সেইসঙ্গে ছন্দ এবং অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন। ফলে বিশিষ্ট বলতে যেগুলি তা আলোকদীপ্ত হয়ে উঠেছে।